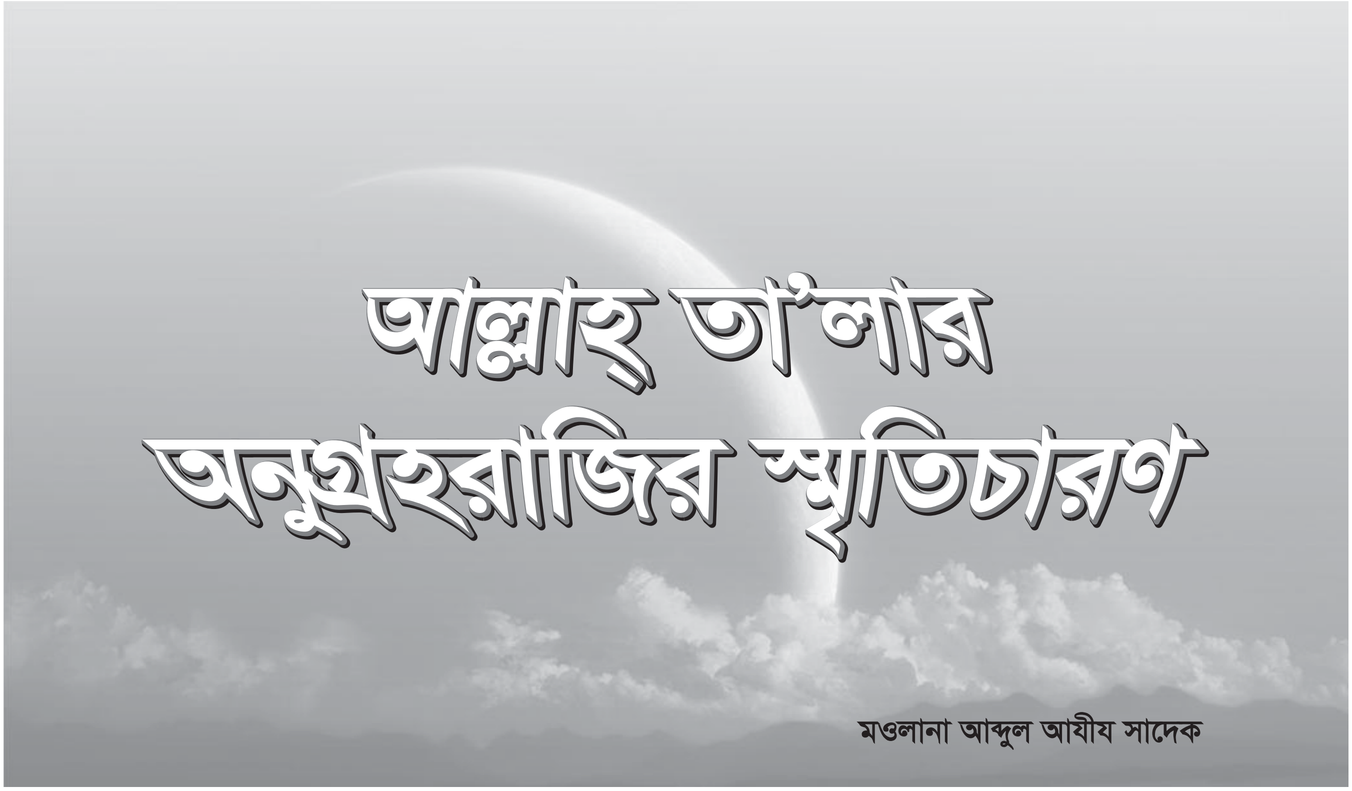

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির স্মৃতিচারণ

মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক

আমার জন্ম আনুমানিক ১৯৩৬ সাল। পিতৃভূমি বর্তমান নরসিংদী জেলার মনোহরদি উপজেলার জীবকায়া গ্রামে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণে প্রভাবশালী শিক্ষিত পরিবার মনিরউদ্দিন মাস্টারের বাড়ি। আমাদের সুসম্পর্ক ছিল পাঠানবাড়ির সাথে যা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে পশ্চিম দিকে।

আমার দাদার নাম নেয়ামত আলী– তাঁকে আমি দেখিনি। পিতার নাম সাহেব আলী, মাতার নাম মালিহা। আমার বয়স যখন ৪-৫ বছর তখন আমার মা ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্মৃতি বলতে গেলে এতটুকুই যে তাঁর মরদেহ বাড়ির সামনে বরই গাছের নিচে রাখা ছিল। আমার বড় দুই বোন যাদের নাম আয়াতুন নেসা ও ফয়যুন নেসা।

বংশের অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ে চাচাতো ভাই আযমত আলী, উমর আলী, আব্দুর রাজ্জাক, ফুপাতো ভাই চান্দ আলী। আরেক ফুপুর বিয়ে হয়েছিল ভাওয়ালে– মাঝে মধ্যে আসতেন, খুব আদর করতেন। শুনেছি, আমাদের পূর্বপুরুষ পশ্চিমের কোন এলাকা থেকে এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। আমার বাবার ডাক নাম ছিল চিনির বাপ। তিনি বেশির ভাগ জমি জমা বিক্রী করে আসাম চলে গিয়েছিলেন। নানী আদর করে আমাদের তিন ভাই বোনকে তার সাথে রেখে দিয়েছিলেন।

নানার বাড়ি রামপুরে। নানার নাম আসু আফ্রাদ। তার চার ছেলে মুনিরউদ্দিন আফ্রাদ, সমিরুদ্দিন আফ্রাদ, আব্দুল হামিদ আফ্রাদ এবং আব্দুর রাজ্জাক আফ্রাদ। পরবর্তীতে আব্দুল হামিদ নামের এক ব্যক্তি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)কে হত্যার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে আমার মামা আব্দুল হামিদ আফ্রাদ আমীর সাহেবকে তাঁর জন্য নতুন নাম প্রস্তাব করার আবেদন করেন। আমীর সাহেব তাঁর নাম রাখেন নূরুদ্দীন আফ্রাদ। আমার মামারা খুব নিরীহ ও দ্বীনদার ছিলেন। এক খালাতো ভাই আনসারউদ্দিন সাহেব নারায়ণগঞ্জে থাকেন– মুখলেস আহমদী। ছোট খালাও বয়আত করেন। জীবকায়ার পশ্চিমে মেজ খালার বাড়িতে বেড়াতে যেতাম – তিনি খুব আদর করতেন।

আমি দেখলাম আমার মামারা শিক্ষিত, ভদ্র– তাদের বাড়ী 'আফ্রাদ বাড়ি' বলে সকলের কাছে সম্মানিত। দেখতাম মামারা আযান দিয়ে নামায পড়তেন। তাদের নামায দেখে আগ্রহ হল। পাঠ্যপুস্তক থেকে নামায শিখে পড়া শুরু করলাম। এরপর আমার জানা মতে আমি নামায ছাড়ি নি। শৈশবকালে সফরের সময়ও নামায বাদ দিই নি। মাঝে মধ্যে স্কুল ও মামার বাড়ির মধ্যে একটা মসজিদে একা নামায পড়তাম। কখনো কখনো চলতে চলতেও মনে মনে পড়ে ফেলতাম। [তখন আমার ধারণা ছিল যে এভাবে নামায পড়া যায়।]

আমার মামা নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব অত্যন্ত দ্বীনদার ও ত্যাগী মানুষ ছিলেন। এক সময় পীরভক্ত ছিলেন। কোন এক সময় রেলে সফরকালে কোন সহযাত্রীর কাছ থেকে তিনি হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)এর আগমনের সংবাদ পান। সংবাদ পাওয়ার পর বিস্তারিত জানার জন্য তিনি পাশ্ববর্তী প্রেমারচর গ্রামে মৌলানা তালেব হোসেন সাহেবের কাছে গেলেন। উল্লেখ্য যে, এ মৌলানা তালেব হোসেন সাহেব "বাঘা মৌলানা" নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাছে বিস্তারিত জেনে বুঝে তিনি বয়আত করলেন। গ্রামে ফিরে বয়আতের ঘটনা বলার পর বাকি তিন ভাইও বয়আত করলেন। তখন আমার বয়স আট-নয় বছর।

আমার বাবা এরই মাঝে অনেক দিন পর আসাম থেকে বাড়িতে আসলেন। তখন মুনিরউদ্দিন আফ্রাদ সাহেব বললেন, "ভাইসাব, ইমাম মাহ্দী আসার কথা ছিল, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলে গেছেন। তিনি এসে গেছেন।" আব্বা মুনিরউদ্দীন আফ্রাদ সাহেবকে খুবই মান্য করতেন– তাঁকে সম্মান

করতেন। আব্বা বললেন, "আপনারা কি করেছেন?" বড় মামা বললেন, "আমরা বয়আত করে নিয়েছি।" আব্বা বললেন, "আমিও বয়আত করবো। কিভাবে বয়আত করতে হবে?" মামা বললেন যে, শুক্রবারে প্রেমারচরে যাব। সেখানে মৌলানা তালেব হোসেন সাহেব আছেন। সেখানে বয়আত করবো। সেখানে আব্বার সাথে আমিও বয়আত করলাম।

তালেব হোসেন সাহেবের এক চাচাতো ভাই ওয়াহেদ হোসেন ছিলেন ডাকাত। মানুষও মারতেন। আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য তখন সকলেই চরম বিরোধিতা করছে– এমনকি রাস্তায় চলতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। পুরো এলাকা বিরোধী হয়ে গেল। এর মাঝে ওয়াহেদ হোসেন সাহেব বয়আত করলেন। অগ্নিপরীক্ষা ছিল, রাস্তাঘাট বন্ধ, মসজিদেও যেতে দিত না। ওয়াহেদ হোসেন একদিন খোলা ছুরি নিয়ে ভরা মসজিদে ঢুকে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "তোমরা আহমদীদের বিরোধিতা করে চলেছো। এখন আমি এখানে নামায পড়বো। আমার পরে আহমদীরা পড়বেন। বাঁচতে চাইলে চলে যাও।" তারা মসজিদ খালি করে দিলেন। তিনি নামায পড়ালেন। পরে কি হল জানা নাই– তবে যুলুম অত্যাচারের ঝড় প্রশমিত হল।

চারদিকে বিরোধিতার মধ্যেও সেগুলো বড় আনন্দের দিন ছিল। ধর্মের সেবার স্পৃহায় সবাই উজ্জীবিত। নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেবের ছিল বড় কুরবানী। নতুন স্ত্রী– বড় শখের স্ত্রী, মহব্বতের সংসার। কিন্তু তিনি এক পাল্লায় আহমদীয়াতের সেবা আর আরেক পাল্লায় স্ত্রী-সংসারকে রাখলেন। ওজনে দেখলেন আহমদীয়াতের পাল্লা ভারি। তখন ভাতিজাকে নিয়ে কাদিয়ান চলে গেলেন। মামা ও মামাতো ভাই সফিরউদ্দীন আফ্রাদ (বড় মামার ছেলে) কাদিয়ান থেকে চিঠি লিখতেন। বড় মামা তা পড়ে শুনাতেন। আমিও শুনাতাম। আমারও আগ্রহ কাদিয়ানে যাব।

এর মধ্যে নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব হযরত খলীফা সানী (রা.)-এর তাহরীকে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। মাঝে ছুটিতে বেড়াতে এসেছিলেন। আব্বা বললেন, "আব্দুল আযীয! আমি তোমাকে কাদিয়ানে নিয়ে যেতে চাই। তুমি কি রাজী আছো?" আমি তো আগে থেকেই উৎসুক। স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষার মধ্যেই চলে গেলাম। সাথে আব্বা, মামাতো ভাই রমিজউদ্দীন আফ্রাদ এবং মামা নূরুদ্দীন আফ্রাদ। পরে শুনেছি, আমার শিক্ষকরা আমার খোঁজ করেছিলেন। কাদিয়ানে গিয়ে আবার ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আব্বা বললেন, "তোমাকে ইসলামের সেবায় ওয়াক্‌ফ করতে চাই। তুমি কি রাজি আছো?" আমি আনন্দের সাথে সম্মতি দিলাম। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, "তুমি ইসলামের সেবার জন্য প্রস্তুত হও।" এরপর থেকে আমাকে আর কোন সাংসারিক দায়িত্বের বিষয়ে ভাবতে হয় নি। কাদিয়ানে নিয়ে গিয়ে আব্বা আমাকে ওয়াকফ করে দিলেন। ওয়াকফের ফরম পূরণ করা হলো। তখন থেকে আল্লাহ্‌র ফযলে ধর্মের সেবার সুযোগ পেয়েছি, কুরআনের সেবার সুযোগ পেয়েছি, ঐ সময় একদিন আব্বার সাথে মাদ্রাসা আহমদীয়ার বোর্ডিং-এর গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ একজন বুযুর্গ আমাদের দেখে পাশের টী স্টলে নিয়ে গেলেন। বিস্কুট-কেক-চা ইত্যাদি দিয়ে খুব আপ্যায়ণ করলেন – সম্মান ও আদরের সাথে। পরে জানলাম ইনি হযরত ড. মুফতি মুহাম্মদ সাদিক (রা.)। তাঁর মহব্বত ও মিষ্টি ব্যবহার আমি আজো ভুলতে পারি না। আল্লাহ্ তাঁদেরকে জান্নাতে উচ্চ মোকাম দান করুন।

দেখেছি, কোন সময় খলীফা সানি জুমআ পড়াতে না পারলে তখন হযরত শের আলী (রা.)কে জুমুআ পড়াতে বলতেন। তখন থেকে তাঁর প্রতি আমার অনুরাগ ও ভক্তি সৃষ্টি হয়। বুঝতে পারি না। সবাই বলতো ফিরিশ্‌তা। কেউ আগে সালাম দিতে পারতো না। আমি একবার চিন্তা করলাম আগে সালাম দেবো। আমি ছোট মানুষ, তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন। অর্ধ-নিম্মিলিত চোখে, অবনত মস্তকে তিনি চলাফেরা করতেন। আমি ভাবলাম আর একটু এগিয়ে যাই। কিন্তু তিনি দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখতেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "আসসালামু আলায়কুম!" এ ভাবে এ ফিরিশ্‌তাতুল্য মানুষটিকে আমি আগে সালাম দিতে ব্যর্থ হলাম।

সাধারণভাবে আমি সাহাবাদের মধ্যে সহানুভূতি, মায়া-মামতা, গরীবদের প্রতি সহানুভূতি এবং উত্তম ব্যবহার ও উত্তম আদর্শ উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখতে পেয়েছি।

একদিন খুব ধুলিঝড় বয়ে গেল। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হত 'আন্ধী'। এর পরপরই আমি জুমুআ পড়ে রাবওয়া থেকে আহমদনগর (রাবওয়া থেকে দুই মাইল দূরে) যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পথে একজন সাহাবীর দেখা পেলাম। তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলাম। তখন আসরের আযান হয়ে গেল। সাহাবী বললেন, চলুন আমরা এখানে কোথাও নামায পড়ে নিই। দু'জন প্রস্তুত হলাম। চারদিকে ধুলো-বালিতে পরিপূর্ণ ছিল। একটি জায়গা একটু ভাল ভেবে আমরা দু'জন নামায পড়তে উদ্যত হলাম। আমরা কিছু দূর্বা ঘাসের ওপর দাঁড়ালাম। তিনি ইমামতির জন্য প্রস্তুত। এমন সময় তিনি তাঁর নিজ কোট খুলে আমার সামনে বিছিয়ে দিলেন। আমি খুব লজ্জাবোধ করলাম। কোট টি তাঁর সামনে দেয়ার চেষ্টা করলাম। অনেক অনুরোধ করলাম। পারলাম না। বাহ্যতঃ এটি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু, এতে সাহাবাদের ত্যাগ, পরোপকারিতা, বিনয়, ইত্যাদির এক অনুপম দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে। এ ঘটনা আজো আমার অন্তরে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলজ্বল করছে।

দেশ ভাগের পরের ঘটনা। খলীফা সানী (রা.) খুৎবায় জামা'তকে সতর্ক করলেন, "ভয়ানক দিন আসছে। এমন দিন, যার কথা কল্পনা করলে তোমাদের কলিজা ফেটে যাবে।" এরপর গ্রীষ্মের ছুটি হল। হুকুম হল, পাঞ্জাবের বাইরে যারা যাবে, তারা যেন ১লা আগষ্টের পূর্বে পাঞ্জাব ত্যাগ করে। আমরা ১৬-১৭ জন বাঙ্গালী – আমি আমার দুই মামাতো ভাই, তারুয়ার কিছু মানুষ, কিছু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ। এদের মধ্যে একজন ছিলেন তৈয়ব আলী সাহেব (দরবেশ)।

দেশে প্রায় এক বছর সময় অতিবাহিত হল। দেশ ত্যাগও হয়ে গেল। দাঙ্গার জন্য ট্রেনের রাস্তা বন্ধ ছিল। কাদিয়ানের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমার মন মানছিল না যে এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে বসে থাকি। আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কাদিয়ান যাওয়ার নিয়্যতে বেরিয়ে পড়লাম। বর্ডারে তখনো কড়াকড়ি ছিল না। কলকাতা পৌঁছলাম। সেখানে মুবাল্লেগ ছিলেন মৌলানা মুহাম্মদ সেলিম সাহেব। তিনি আমার হাল-অবস্থা শুনে দিল্লীর মুবাল্লেগ মৌলানা বশীর আহমদ সাহেবকে একটি চিঠি লিখে দিলেন। তখন পর্যন্ত আমার হাতে ট্রেনের খরচই মাত্র ছিল। যাহোক দিল্লী পৌঁছে গেলাম।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে উঠার সময় এত ভীড় ছিল যে, বড়রাও উঠতে পারছিলেন না। আমি কুলি ঠিক করলাম। তাকে বললাম, জানালা দিয়ে মালসহ আমাকে ঢুকিয়ে দিবে। আমি তার চাহিদামত বাড়তি টাকা দিলাম। এখানে কোনমতে ট্রেনে চড়ে গেলাম। সে সময়

দাঙ্গার কারণে মুসলমানদের জন্য ট্রেনের রাস্তা নিরাপদ ছিল না। ভয়ে তারা চলাচল করতো না। আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। আসে পাশে সবাই হিন্দু বা শিখ। পাশের হিন্দু লোক জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছি। বাড়িতে আমাকে মুরব্বীগণ বলেছিলেন, তুমি যে পাঞ্জাবে যাচ্ছ এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না। আমি বললাম, "দিল্লী যাচ্ছি"। তিনি অবাক হলেন – আমি মুসলমান, ছোট বাচ্চা ছেলে, এ রাস্তায় একা সফর! তিনি গাড়িতে বসা অন্য লোকদেরকে বললেন, দেখ, এ ছোট মুসলমান বাচ্চা একা দিল্লী যাচ্ছে! শিখ ও হিন্দুরা অবাক হয়ে তাকালো – কত বড় সাহস, এ ছোট বাচ্চা একা এ বিপজ্জনক রাস্তা সফর করছে! যাহোক, দিল্লী পৌঁছলাম। মুবাল্লিগ সাহেবকে চিঠি দিলাম। তাকে সাহায্যের অনুরোধ করা ছিল। তিনি বললেন, পাকিস্তানের রাস্তাতো বন্ধ। এরপর আর কিছু বললেন না। (কয়েক দিন পর) দিল্লী থেকে লাহোর প্লেনের টিকেটের ব্যবস্থা করে দিলেন।

লাহোর হয়ে রাবওয়া পৌঁছলাম। নাযের তালীম জনাব আব্দুস সালাম আখতার সাহেব আমাকে জামেয়ায় পাঠালেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মাস্টার গোলাম হায়দার সাহেব রিপোর্ট দিলেন। এরপর জামেয়ায় প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে গেলাম। একটি অদ্ভুত বিষয় হল, আমার ম্যাট্রিক পাশ করা হয়নি। এমনকি স্কুলে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াও হয়নি। কিন্তু আমার পড়াশোনার ঝোঁক ছিল। আমার শারিরীক যোগ্যতা যাচাই করেই আমাকে জামেয়ায় সরাসরি ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়। আমি সব সময় পরিশ্রম করেছি, যেন সঙ্গীদের পিছনে না থাকি।

আমার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন আবুল আতা জলন্ধরী (প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া), মৌলানা যহুর হোসেন (মুবাল্লেগ বুখারা), মৌলানা আবুল হাসান কুদসী [সৈয়দুশ্ শুহাদা সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ (রা.) এর পুত্র], মৌলানা জাফর আহমদ জাফর (তিনি ভাল কবিও ছিলেন), মৌলানা চৌধুরী গোলাম হায়দার, মৌলানা কুরাইশী মুহাম্মদ নযীর সুলতানী, প্রমুখ। শিক্ষক মহোদয় বড় মহব্বতের সাথে তালীম-তরবিয়ত দিয়েছেন। তাদের তরবিয়তের ফলে দ্বীনের খাদেম হলাম।

তাঁদের ব্যবহারিক তরবিয়তের ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দিই। একবার আসরের দিকে খেলার মাঠে যাওয়ার আগে বুট ভাজা খাচ্ছিলাম। কয়েকটা পড়ে গেল। দেখলাম আমাদের শিক্ষক মৌলানা মুহাম্মদ শফি আশরাফ তুলে ফু দিয়ে খেয়ে নিলেন।

আমার ক্লাসে ১৬-১৭ জন ছাত্র। এর মধ্যে স্মরণ আছে মওলানা মোহাম্মদ এরশাদ বশীর, মওলানা বশীর আহমদ কাদিয়ানী, মওলানা মাসুদ আহমদ ঝিলামী, মওলানা নাসির আহমদ খান (মুবাল্লেগ লেবানন) প্রমুখ। মওলানা মাসুদ ঝিলামী আমার পরম বন্ধু ছিলেন। পরস্পর সহযোগিতা ছিল, সুখ-দুঃখে একে অপরের সাথী ছিলাম। পরবর্তীতে আরো যাদের সঙ্গে পড়াশুনা করেছি তাদের মধ্যে রয়েছেন মওলানা উসমান চিনী, মওলানা আব্দুল ওয়াহাব আদম (আমীর ঘানা), মওলানা মাহমুদ আহমদ শুবুতী (মুবাল্লেগ, আদন-ইয়েমেন)। আমার আরেকজন সহপাঠী ছিলেন মওলানা আব্দুল আযীয ওয়ায়েস (মুবাল্লেগ, ফিজি)। দু'জনের নাম আব্দুল আযীয হওয়াতে আমি পার্থক্য করার জন্য আমার নামের পরে পারভেজ যুক্ত করতে চাইলে আমার শিক্ষক আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব বললেন যে পারস্য সম্রাট পারভেজ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পত্রের অবমাননা করে এবং তাঁকে হত্যার জন্য লোক পাঠিয়ে তার পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধ্বংস হয়েছিল। তাই তার নাম যুক্ত না করে তিনি আমার নামের সঙ্গে সাদেক শব্দটি যুক্ত করে দিলেন।

জামেয়ায় আল্লাহ্‌র ফযলে আমার ফলাফল ভাল ছিল। জামেয়ায় ছয় বছর পড়ার পর জামেয়াতুল মুবাশ্শেরীনে তিন বছর উচ্চতর পড়াশুনা করে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করলাম। এখন শাহেদ ডিগ্রী প্রদানের পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও এর মধ্যে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স-ইন-এ্যারাবিক বা মৌলভী ফাযেল ডিগ্রী লাভ করলাম।

পাশের পর রাবওয়ায় বিভিন্ন দপ্তরে আমাকে কাজ শেখার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। সে সময় নেযারত তালীম, নেযারত মাল, নেযারত উমূরে আমা, প্রভৃতি বিভাগে আমার কিছু দিন কাজ করার সুযোগ হয়। এরপর একজন সিনিয়ার মুরব্বী মৌলানা সৈয়দ আহমদ আলী শাহ্-এর অধীনে প্র্যাক্টিকাল অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রায় এক বছরের জন্য আমাকে লায়লপুর (বর্তমান ফয়সালাবাদ)-এ পাঠানো হয়। আমার সাথী ছিলেন মওলানা আব্দুল আযীয ওয়ায়েস।

"১৯৯২ সালের ২৯ অক্টোবর বকশীবাজারে আমাদের মসজিদ আক্রান্ত হলে আমার হাঁড় ভেঙ্গে দেয়া হয়, মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়। হাসপাতালে অন্য রোগীরা জিজ্ঞাসা করেন কিভাবে আহত হয়েছি, তখন বলি যে, মৌলবীদের আক্রমণে এ হাল হয়েছে। তারা বিস্ময় প্রকাশ করে যে, কেমন মৌলবী, ধর্মের নামে এভাবে আঘাত করে!"

মওলানা সৈয়দ আহমদ আলী শাহ সাহেব আমাদেরকে বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে ও মফস্বল টাউনে নিয়ে যেতেন এবং ব্যবহারিক শিক্ষা দিতেন। উনার কাছ থেকে অনেক শিখেছি; তালীম, তবলীগ, বহস, তরবিয়ত, প্রভৃতি। পরম মহব্বত ও স্নেহ-মমতার সাথে শিক্ষা দিয়েছেন। উঠতি বয়সের ছিলাম, ঘুমের প্রয়োজন ছিল। উনি লক্ষ্য রাখতেন। একবার স্মরণ আছে, তাহাজ্জুদের সময় তিনি উঠে

তাহাজ্জুদ পড়লেন, কিন্তু আমাদের ওপর গরম কাপড় দিয়ে দিলেন, যেন আরেকটু ঘুমাতে পারি। কখনো ফজরের আযানের পর আমাদের উঠাতেন। তাঁর স্নেহ-মমতা,সুশিক্ষার অনেক প্রভাব আমি আজো অনুভব করি, স্মরণ করি।

এরপর স্বাধীন মুরব্বী হিসেবে প্রথম পোস্টিং হয় ফয়সালাবাদের কাছে সমুদ্রী নামক স্থানে। সেখানকার একটি ঘটনা: একবার সফরে মামু-কাঞ্জন নামের এক এলাকায় গেলাম। সেখানকার গয়ের আহমদী জামে মসজিদে একটা জামেয়া চালু ছিল ধর্মীয় উচ্চ-শিক্ষার জন্য। ঘুরতে ঘুরতে সেখানে দুপুর হয়ে গেল। এরই মাঝে কথায় কথায় তারা বুঝে গেল যে আমি আহমদী। ধর্মীয় আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হল। যোহরের সময় তারা বড় জামাত করলেন, আমি পৃথক দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। এরপর আবার আলোচনা শুরু হল। অনেক ছাত্র-শিক্ষক শামিল হলেন। আলোচনার মধ্যে তাদের একজন শিক্ষক কিছু অনৈতিক/অযৌক্তিক কথা বলে আমাকে কষ্ট দিলেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে লাগলো। তখন তাদের মাঝে একজন অবস্থা দেখে আমাকে নিরাপদে নিকটতম স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। উঠে আসার সময়ও কেউ কেউ আমাকে ধাক্কা দেয়, আঘাত করার চেষ্টা করে। কয়েকজন অবশ্য এমন আচরণের নিন্দাও করেন।

চলে আসার ১০/১২ দিন পর আহমদী ভাইদের মাধ্যমে জানতে পারলাম, যিনি আমাকে অপমান করতে চেয়েছিলেন, ধাক্কা দিয়েছিলেন, তিনি মহা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছেন। তার নারীঘটিত কেলেঙ্কারী প্রকাশ পায় এবং এভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত উচিত শাস্তির শিকার হন।

এরপর ১৯৬৩/১৯৬৪ তে আমার পোস্টিং হয় বাংলাদেশে (অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে)। তখন মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব প্রাদেশিক আমীর। তিনি আমাকে ঢাকা থেকে উত্তর বঙ্গের বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর ইত্যাদি এলাকার জন্য দায়িত্ব দিলেন। আহমদনগর সেন্টার করা হল। পরবর্তীতে কিছুদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও দায়িত্ব পালন করি।

১৯৬৮ সালে রাবওয়া জলসায় যাওয়ার প্রস্তুতির জন্য ঢাকায় আসলাম। এখানে উথলী জামা'তের বিশিষ্ট বুযুর্গ আমীর হোসেন সাহেবের বড় কন্যা হোসনে আরা বেগমের সাথে আমার বিয়ে হল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কুরআনের বাংলা অনুবাদের কাজের জন্য বোর্ড গঠন করলেন। এর সদস্য ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, মৌলানা চৌধুরী মুজাফ্ফর উদ্দিন, এডিটর রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স, এবং খাকসার আব্দুল আযীয সাদেক। হুযূর (রাহে.) পরামর্শ চাইলে মৌলানা কাযী মুহাম্মদ নযীর লায়লপুরী, নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ এবং মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার আমার নাম সুপারিশ করেন। কমিটিকে রাবওয়া জলসার পর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব রাবওয়া অবস্থান কালে একত্রে কাজ করতে বলা হয়। আমাকে এ কাজের জন্য রাবওয়ায় রেখে দেয়া হয়। এভাবে ১৯৬৯ সালের রাবওয়া জলসার পর থেকে কুরআনের বাংলা অনুবাদের জন্য আমি রাবওয়ায় অবস্থান করি। সেই সাথে চিঠিপত্র অনুবাদের কাজও করি। আমার স্ত্রী আমাদের নবজাত বড় মেয়েকে নিয়ে পরের বছর জলসার সময় রাবওয়ায় আসেন।

১৯৭০ সালের জলসার পর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব বেশ কিছু দিন রাবওয়া অবস্থান করেন। আমরা তিন জন একসঙ্গে বসে কাজ করতাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব ঢাকা চলে আসলেন। আমরা দুইজন কাজ করতে থাকলাম। ৮-১০ মাস পর মৌলানা চৌধুরী মুজাফ্ফর উদ্দিন সাহেব ইন্তেকাল করলেন। আমি একা কাজ করতে থাকলাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক পর্যায়ে হুযূর (রাহে.) আমাকে বাংলাদেশে পাঠালেন যেন মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পারি।

১৯৭৯ সালে আমি স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা সহ দেশে চলে আসি। পরে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আরেক কন্যা সন্তান দান করেন। এরপরে দেশে কুরআনের অনুবাদ ও বিভিন্ন এলাকায় তবলীগ ও তালীম-তরবিয়তের কাজের সুযোগ পেয়েছি, ধর্মের জন্য রক্ত দেয়ার সুযোগ পেয়েছি।

১৯৯২ সালের ২৯ অক্টোবর বকশীবাজারে আমাদের মসজিদ আক্রান্ত হলে আমার হাঁড় ভেঙ্গে দেয়া হয়, মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়। হাসপাতালে অন্য রোগীরা জিজ্ঞাসা করেন কিভাবে আহত হয়েছি, তখন বলি যে, মৌলবীদের আক্রমণে এ হাল হয়েছে। তারা বিস্ময় প্রকাশ করে যে, কেমন মৌলবী, ধর্মের নামে এভাবে আঘাত করে!” যাহোক, সময়ের সাথে আল্লাহ্ আরোগ্য দিয়েছেন। হাতে মাথায় আঘাতের চিহ্ন এখনও আছে। ইনশাআল্লাহ্, এ চিহ্ন নিয়েই এ জগত থেকে বিদায় নিব।

এছাড়াও বাহেরচরে বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা গুরুতর আহত হওয়া, মাহিল্যায় কারাবরণ, (বাহেরচর ও মাহিল্যার ঘটনাবলী ইতিপূর্বে পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশিত হয়েছে) প্রভৃতিসহ দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় তবলীগের সুযোগ আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন। আহমদনগর থেকে কয়েক মাইল দূরে প্রতিষ্ঠিত কমলাপুকুরী জামা'তসহ বিভিন্ন এলাকায় সূচনালগ্নে কাজের সুযোগ হয়েছে।

বর্তমানে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরবী পুস্তক 'আল ইস্তিফ্‌তা' এর অনুবাদ করছি। আমি খুবই আনন্দিত ও সৌভাগ্যবান যে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আরোগ্য দান করে ধর্মের সেবা করার আরো সুযোগ দিয়েছেন, কুরআনের সেবার সুযোগ দিয়েছেন। আলহাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অনুলিখন : ***আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক***